Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – I, Issue-IV, published on October 2021, Page No. 1 –5
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' : নারীত্ব ও সতীত্বের সংঘাত

সারদা বিষ্ণু
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি, বোলপুর
ইমেইল : saradabishnu8@gmail.com

অধ্যাপক ড. অনাথ বন্ধু চট্টোপাধ্যায়
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
বাংলা বিভাগ
সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি, বোলপুর

Keyword
রবীন্দ্রনাথ, উপন্যাস, সংসার জীবন, নর–নারী, চোখের বালি, নৌকাডুবি

Abstract

Discussion

চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসের নর–নারীর অন্তর্জগতের ঘাত–প্রতিঘাত ও ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ার, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পথ পরিত্যাগ করে 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে ব্যক্তি জীবনের সমস্যার সঙ্গে সংসার ও সমাজ জীবনের সমস্যাকে বিজড়িত করে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'চোখের বালি'–র কাহিনী নির্মাণে বহির্জগতের ঘটনা অপেক্ষা মানুষের মনোজগতের অর্থাৎ নর–নারীর মনের কারখানায় রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করেছেন। 'চোখের বালি'–র তিন বছর পরে রচিত উপন্যাসে পুনরায় যেন বহির্জগতের ঘটনা নর–নারীর দাম্পত্য জীবনে ও সংসার জীবনে এক কৌতুককর দৈব দুর্বিপাক সংঘটিত সমস্যার সৃষ্টি করেছিলো। দৈব দুর্বিপাকে নৌকাডুবি ঘটেছে। ফলে নব বিবাহিতা কমলা–রমেশ নামে এক যুবকের পাশে স্থান পেয়েছে মূর্ছিত অবস্থায়। 'নৌকাডুবি'–র ফলে রমেশ–হেমনলিনী এবং নলিনাক্ষ–কমলা এই চারজন নর–নারীর জীবন ওলট–পালট হয়ে যায়। রমেশের বাগদত্তা ছিল হেমনলিনী। হেমনলিনী সে নলিনাক্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল এবং নলিনাক্ষের নববধূ কমলা যুক্ত হয়ে গেল রমেশের সঙ্গে। ভাগ্যের পরিহাসে কমলা হারিয়েছিল তার স্বামী নলিনাক্ষকে এবং অপর নৌকায় বরবেশী রমেশ হারিয়েছিল তার নববধূ সুশীলা–কে। যাই হোক, নববধূ কমলা রমেশকে স্বামী ভেবে তার সঙ্গে নতুন সংসার জীবন শুরু করে দিল। এইভাবে এক কৌতুককর রোমান্সধর্মী 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের প্লট–টি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটির শিরোনামে 'নৌকাডুবি' শব্দটিকে বসিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসতর্ক মুহূর্তের সৃষ্টি 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে বিবাহিতা নারী মনে সতী সংস্কার অর্থাৎ স্বামী সংস্কার–কে এক নতুন মাত্রা এনে দিলেন।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য রমেশ সবকিছু বুঝেও প্রকৃত ঘটনাটি প্রকাশ না করে কমলার কাছ থেকে দূরে দূরে অবস্থান করতে লাগল। অবশেষে নানা ঘটনার ঘনঘটার পথ অতিক্রম করে কমলার প্রকৃত স্বামী নলিনাক্ষের সন্ধান

পাওয়া গেল। আর এখানেই নারী মনের স্বামী–সংস্কার প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করল। রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন যে আমাদের ভারতীয় সমাজে নারী মনে স্বামী সংস্কার কতখানি গভীরে মনের অবচেতন স্তরেও শিকড় বিস্তার করে থাকে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,–

"স্বামী সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে সংস্কার আমাদের দেশের মেয়েদের মনে আছে, তার মূল এত গভীরে কিনা যাতে অজ্ঞান জনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্কারের সঙ্গে ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু এসব প্রশ্নের সার্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়।" [১]

এরই ফলে সৃষ্টি হল নারীত্ব ও সতীত্বের সংঘাত। রবীন্দ্রনাথ যেন বিবাহিতা নারী মনের গভীরে ডুব দিয়েছেন এবং নারীমনের স্বামী সংস্কার–কে ডুবুরির মতই তুলে এনেছেন উপন্যাসের পাতায়। বেশিরভাগ ভারতীয় নারী ব্যক্তি স্বামী–কে নয়, স্বামী নামক আইডিয়াকে আঁকড়ে ধরে সংসার বৈতরণী পাড় হতে চায়। কমলা যখনই জানতে পারল, এই রমেশ নামক ব্যক্তিটি তার স্বামী নয়, সে মুহূর্তেই এতদিনের পরিচিত ব্যক্তিটিকে ভুলে গিয়ে তার মন তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠল অপরিচিত স্বামী নলিনাক্ষের জন্য। যাই হোক, কমলার সঙ্গে রমেশের ভ্রান্তি–বিলাসের গ্রন্থি সৃষ্টি হওয়ায় রমেশের পক্ষে আর হেমনলিনীকে পাওয়া হল না। কিন্তু কমলা–নলিনাক্ষ দাম্পত্য জীবনের সুখ–শান্তি সবই ফিরে পেয়েছে। সেকারণে রমেশ–হেমনলিনী–র যেমন বিচ্ছেদ ঘটেছে, অপরদিকে আবার নলিনাক্ষ–কমলার মাধুর্যময় দাম্পত্য জীবন শুরু হয়েছে।–

"যে সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহার মধ্যে 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) উপন্যাসটি রোমান্সের ন্যায় একটি বিস্ময়কর সংঘটনের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে দৈব বিপর্যয় রমেশ ও কমলা পরস্পরের সহিত দুশ্ছেদ্য গ্রন্থি–বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে ফেলা যায় না, আবার নলিনাক্ষ ও কমলার পুনর্মিলনের মধ্যেও দৈবের অঙ্গুলি সংকেত একটু বেশী রকম সুস্পষ্ট। যে ভ্রান্তি–যবনিকা রমেশ ও কমলার মধ্যের সম্বন্ধটি সত্য হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে তাহার অপসারণ একটু অনাবশ্যক রূপেই বিলম্বিত হইয়াছে।" [২]

নারীত্বের দুটি রূপ 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত করেছেন। একদিকে কমলা এবং অপরদিকে হেমনলিনী। একদিকে নারীমনের স্বামী সংস্কার যা বিশ শতকের শেষার্ধ–কে অতিক্রম করে আজও বাংলার গ্রাম সমাজের নারীরা পূজারিণী। তারা আজও এয়োতির চিহ্ন স্বরূপ শাখা–সিঁদুরকে মর্যাদা দিয়ে স্বামী–সংস্কারকে অধিকমাত্রায় মূল্য দিয়ে থাকে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কমলার মধ্যে। অপরদিকে স্বশিক্ষিতা হেমনলিনী তার মনে এই স্বামী সংস্কার তেমন গভীরে শিকড় বিস্তার করতে পারেনি। অবশ্য তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই স্বামী সংস্কার নারী মনের কত গভীরে যে শিকড় বিস্তার করে রয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তার চিত্র চিত্রণে সার্থক হয়েছেন বলা যায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে বাংলার সমাজ ও বাংলাদেশের আর্থ–সামাজিক প্রেক্ষাপটে বর্তমানে অবশ্য নারী মনের এই স্বামী সংস্কার তেমন মূল্য দাবী করতে পারে না। এখন বিবাহিতা নারী তার রক্ত মাংসের ব্যক্তিস্বামীকে বিশেষ মূল্য দিয়ে সংসার নির্বাহ করে চলে। কমলার স্বামীর খোঁজ না পেয়ে রমেশ যখন কমলাকে স্ত্রী হিসাবে মনে মনে মেনে নিতে শুরু করল, ঠিক তখনই রমেশের অনুপস্থিতিতে হেমনলিনীকে লেখা চিঠি থেকে কমলা জানতে পারল যে এতদিন যাকে সে স্বামী বলে জেনেছে, সেই রমেশ তার কেউ নয়। সঙ্গে সঙ্গে কমলা স্বামী অন্বেষণে বেড়িয়ে পড়েছে। এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে সৃষ্টি করেছে নারীত্বের সঙ্গে সতীত্বের সংঘাত। কমলা তার নারীত্বকে মূল্য না দিয়ে সে তার স্বামী সংস্কারের বশে শেষ পর্যন্ত নলিনাক্ষের সঙ্গে স্বামী–স্ত্রী হিসাবে সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করতে লাগল। আমরা বলতে পারি, মানুষের প্রবৃত্তি সংস্কারের উপর যে কতখানি নির্ভর করে তা উপন্যাসটির অন্যতম নায়িকা কমলার ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছে–

"যে মুহূর্তে সে জানিল, সে রমেশের স্ত্রী নয়, নলিনাক্ষ তাহার স্বামী, সেই মুহূর্তেই নলিনাক্ষের প্রতি তাহার সমস্ত চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল, এবং তাহাকে ফিরিয়া পাইবার আগ্রহে সে চক্রবর্তী পরিবারের স্নেহ চক্রান্তের মধ্যে জড়াইয়া পড়িল। যে রমেশের সঙ্গে সে এতদিন ঘর করিল, মেলামেশা করিল, সেই রমেশের কথা একবারও মনে পড়িল না, একথা ভাবিতে বাস্তবানুভূতি অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয় বই কি ! কমলার এই ব্যবহার এবং নলিনাক্ষের অতি-মানুষিক জীবন-ভঙ্গী দুইয়ে মিলিয়া এই পুনর্মিলন ব্যাপারটিকে কেমন যেন একটু রোম্যান্টিক করিয়া তুলিয়াছে।" [৩]

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত নৌকাডুবির দৈব দুর্বিপাকে সংঘটিত ভ্রান্তিকে সামনে রেখেই নারীত্ব ও সতীত্বের সংঘাতকে সামনে নিয়ে এলেন। আবার কমলার স্বামী নলিনাক্ষের মধ্য দিয়ে সংস্কার মুক্তির পথেও এগিয়ে গেলেন। 'নৌকাডুবি'-তে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য দেখাতে চান বিবাহিতা নারীর স্বামী সংস্কার। এই স্বামী সংস্কার জয়ী হলেও কমলা চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাত কিন্তু দেখানো হয়নি। আর দেখানো হয়নি বলেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ হেমনলিনীর মতো একটি স্বশিক্ষিতা স্বামী সংস্কারে অনীহা ও প্রেমের পূজারিণী হেমনলিনী চরিত্রকে চিত্রিত করলেন। সে কারণে কমলার স্বামী সংস্কারের মধ্যে হেমনলিনীকে পাওয়া যাবে না। উল্লেখ করা যেতে পারে, উপন্যাস দেশ-কাল সম্পৃক্ত এবং উপন্যাসে প্রতিফলিত লেখকের জীবন দর্শন কালের কোষ্ঠী পাথরে যাচাই হয়ে শাশ্বতকালের সাহিত্যের সামগ্রী হয়ে ওঠে। বিবাহিতা নারীর স্বামী নামক আইডিয়ার পূজারিণী হবার প্রবণতা এই একবিংশ শতাব্দীতে খুব একটা পরিলক্ষিত না হলেও বিশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত আলোচ্য উপন্যাসের নায়িকা কমলার পক্ষে এটা স্বাভাবিক প্রবণতা বলেই ধরে নিতে হবে।

প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার বিচারে নৌকাডুবি উপন্যাসের দৈব ঘটনা সংঘটিত অসংগতি রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক প্রতিভার আনুকূল্য না পেলেও অনেকটা প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হলে হলেও, 'নৌকাডুবি'-র আখ্যানভাগ গল্পরস সমৃদ্ধ এবং তা রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক চেতনায় সমৃদ্ধ। তবে রমেশ-কমলা, হেমনলিনী-নলিনাক্ষ প্রমুখ চরিত্রগুলির মনোবিশ্লেষণ করে দেখানোর হয়তো সুযোগ পাননি লেখক রবীন্দ্রনাথ। কমলার নারী মনের স্বামী সংস্কার ও তার সঙ্গে নারী ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং প্রেমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখাবার সুযোগ উপন্যাসে থাকলেও রবীন্দ্রনাথের অসতর্ক মনের আকস্মিক সৃষ্টি বলে 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের বিচার করলে, এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়ে যাই। যেমন হেমনলিনীর প্রেমের বিকাশ ও বিচ্ছেদ দেখানোর সুযোগ থাকলেও কমলা ও রমেশের দিকে অধিকমাত্রায় দৃষ্টিপাত করায় সেটা হয়তো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কমলা চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের রক্ষণশীল মনোভাবের কিছুটা প্রশয় ছিল। তবে কমলা যে সংসার ও সামাজিক পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছে, তাতে তার মনে এই ধরনের স্বামীকেন্দ্রিক সংস্কারের জন্ম হওয়া স্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কমলাই মামার আশ্রয়ে বেড়ে উঠেছিল। সেকারণে স্নেহ-ভালোবাসার পরিবর্তে তার উপেক্ষা ও লাঞ্ছনাই অধিকমাত্রায় জুটেছিল। আবার কমলার মধ্যে ছিল পরিণত নারী ব্যক্তিত্বের বিকাশের অভাব। আমাদের বাংলার তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে ও সাংসারিক আঙিনায় আর পাঁচটা কিশোরী মেয়েদের মতই সে স্বামী পূজারিণী হয়ে তাকে বরণ করতে প্রস্তুত হচ্ছিল। উনিশ শতকের শেষার্ধ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার সমাজ ও সংসার এই ভাবনারই আনুকূল্য করেছিলো।

উপন্যাসে কমলার পাশাপাশি পড়ন্ত বেলার রোদের মতই হেমনলিনী ও রমেশের প্রেমপর্ব চিত্রিত হয়ে কমলার স্বামী নলিনাক্ষর সঙ্গে কমলার মিলনের অধ্যায়টি রচনা করেছে। হেমনলিনীর সঙ্গে রমেশের প্রেম শেষ পর্যন্ত বিয়ের ছাড়পত্র পায়নি। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হয়ে গেলেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু হেমনলিনীকে নিয়ে কমলার মতো তার বিয়ের ভাবনা-চিন্তা করেননি। হেমনলিনী ও রমেশের প্রেমপর্ব উপন্যাসটিতে তেমন গুরুত্ব পাইনি। অথচ হেমনলিনীকে লেখা

রমেশের চিঠির সূত্র ধরেই কমলা তার স্বামী নলিনাক্ষর সন্ধানী হয়েছিল। তবুও হেমনলিনীর আবির্ভাব যেন রবীন্দ্র উপন্যাসে নায়িকা বিবর্তনের উত্তরণে এক নূতনতর পদক্ষেপ বা পূর্বাভাস বলা যায়। এ প্রসঙ্গের আলোচনায় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হেমনলিনীর যথার্থ মূল্যায়ন করে লিখেছেন, –

"রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসে আমরা যে জাতীয় নায়িকার সহিত পরিচিত হই, হেমনলিনীই সেই সুপরিচিত type এর প্রথম উদাহরণ। সে 'গোরা'র সুচরিতা, 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য ও 'যোগাযোগ'-এর কুমুদিনীর পূর্ববর্তিনী – শান্ত, সংযত, নীরব, একনিষ্ঠ প্রেমে আত্ম-সমাহিত, কোমল, অথচ অবিচলিত দৃঢ়তায় সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখীন। এই জাতীয় নায়িকারা একদিকে যেমন তাহাদের চারিদিকে একটি মৃদু সৌরভ বিকীর্ণ করে, সেইরূপ অপরদিকে একটা উত্তেজনাহীন অন্তঃসঞ্চিত শক্তির আভাস দেয়।" [৪]

নলিনাক্ষ হেমনলিনীকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মধ্যে প্রেমের রঙ তেমন রঞ্জিত হয়নি। আর নলিনাক্ষকে সম্মান দিয়ে শ্রদ্ধা করত হেমনলিনী। এই বিয়েতে হেমনলিনীও যেন নিজেকে আত্মবিসর্জন দিতে চেয়েছিল। কিন্তু হেমনলিনী ও রমেশের প্রেম পরস্পরের উপর বোঝাপড়ার মাধ্যমেই ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করেছিল। হেমনলিনী প্রেমমন্ত্রে ধীর স্থির এবং দৃঢ়চিত্ত। বিবাহিত জীবনে পরিতৃপ্তির প্রত্যাশী। হেমনলিনীর মনের মধ্যে প্রেমের যতখানি গভীরতা ছিল ঠিক ততখানি এই স্বশিক্ষিতা নারীর মনের গভীরে কমলার মতো স্বামী সংস্কার শিকড় বিস্তার করতে পারেনি, –

"হেমনলিনী নলিনাক্ষের সহিত বিবাহে সম্মতি দিয়া মনকে বুঝাইতে লাগিল, 'আমার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছে।' মনে মনে সহস্রবার করিয়া বলিল, 'আমার পুরাতন বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেছে, আমার জীবনের আকাশকে বেষ্টন করিয়া যে ঝড়ের মেঘ জমিয়া উঠিয়াছিল তাহা একেবারে কাটিয়া গেছে। এখন আমি স্বাধীন, আমার অতীতকালের অবিশ্রাম আক্রমণ হইতে নির্মুক্ত।' এই কথা বারংবার বলিয়া সে একটা বৃহৎ বৈরাগ্যের আনন্দ অনুভব করিল। শ্মশানে দাহকৃত্যের পর এই প্রকাণ্ড সংসার তাহার বিপুল ভার পরিহার করিয়া যখন খেলার মতো হইয়া দেখা দেয় তখন কিছুকালের মতো মন যেমন লঘু হইয়া যায়, হেমনলিনীর ঠিক সেই অবস্থা হইল – সে নিজের জীবনের একাংশের নিঃশেষ-অবসাদ-জনিত শান্তি লাভ করিল।" [৫]

শেষ পর্যন্ত কমলার সতীসংস্কার ও সতীত্বের সংঘাতে হেমনলিনীর মতো নারীত্ব মূল্য না পেলেও নারী হৃদয়ের সতী সংস্কারই মূল্য পেল। আর ঘটনার তির্যক পরিণতিতে হেমনলিনী যেন একটা ধূসর বৈরাগ্যের পরম আনন্দ উপলব্ধি করে নিজেকে কমলা-নলিনাক্ষর সমাপ্তি অধ্যায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পেরেছিলও। কমলার সমাপ্তি স্বামী মিলনে মাধুর্যময় হলেও হেমনলিনী উপন্যাসটিতে যেন Tragic Heroine হয়েই থেকে গেছে।

নৌকাডুবির ফলে নববধূ কমলা রমেশকেই তার স্বামী বলেই জেনেছে এবং নারী মনের সংস্কার বশত রমেশের পায়েই তার হৃদয়-মন নিবেদন করতে চেয়েছে। কিন্তু রমেশ কমলা যে পরস্ত্রী এটা জানত বলে সংকোচে এড়িয়ে গেছে। সামাজিক স্বীকৃতি না থাকায় রমেশের হৃদয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাত উপন্যাসটিতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। গাজীপুরে চক্রবর্তীর মেয়ে শৈলজার সাহচর্যে ও স্বামী প্রেমে কমলার হৃদয় রমেশকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য প্রেমের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত নলিনাক্ষকে স্বামী হিসাবে পেয়ে কমলার হৃদয়ে যে অন্তর্বিপ্লব ঘটছে, তার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ কৃতিত্ব ও প্রশংসা দাবী করতে পারেন। কমলার অবচেতন মনে নিহিত দৃঢ়তার সতী সংস্কার শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। কমলা তাই ভারতীয় সামাজিক মূল্যবোধেরই প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। ভারতীয় সনাতন বৈদিক মন্ত্র পড়ে বিবাহিতা নারীর কাছে ব্যক্তি স্বামী যেহেতু তার মনে স্বামী নামক আইডিয়ারই প্রতীক ; তাই আর কমলার নিকট রমেশের কোনো মূল্যই রইল না। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্বামী নলিনাক্ষের দিকে তার মন ধাবিত হয়েছে, এবং সমাজ নির্ধারিত বিবাহ নির্ভর প্রেমই মূল্য পেয়ে কমলা সতী ধর্মের পরাকাষ্ঠা হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে চিরাচরিত সামাজিক বিবাহ প্রথায় নারীর স্বচ্ছ চেতনা যেভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যায় কমলা চরিত্র তারই নিদর্শন হয়ে উঠেছে। এইভাবে ক্রম

পরিণতির দিকে এগিয়ে নৌকাডুবি উপন্যাসে নারীত্ব ও সতীত্বের সংঘাতে দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ কমলার মনে সতী সংস্কারই জয়ী হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি :

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), নৌকাডুবি, সূচনা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আশ্বিন ১৩৯২, পৃষ্ঠা ৩৪৭।
২। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৩৬৯, পৃষ্ঠা ১৪০।
৩। নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম সংস্করণ(পরিশোধিত), শ্রাবণ ১৩৬৯, পৃষ্ঠা ৪০৫-৪০৬
৪। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধরা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪১
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), নৌকাডুবি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫০১